ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1417-1426
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.362

মতি নন্দীর ‘শবাগার’: সত্তরের উত্তাপদগ্ধ আবর্তে অবক্ষয়ী মন ও হিমশীতল মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বগামী পারদ

মহেন্দ্র নাথ পাল, গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The 1970s marked a period of terrifying, turbulent deadlock in the heart of Bengal. On one side stood fierce resistance; on the other, retaliatory repression. Caught in this turbulent vortex of the Naxalite era, human lives drifted like mere straws in the current. The complacent slumber of the mind and consciousness was shattered. The veneer of values—which had, until then, clung fast to human existence—began to crumble away. A chilling fear of death constantly encroached upon and consumed the very last frontiers of human consciousness. As one struggled to cut through the silt of that worm-eaten era, the decay of the human psyche emerged as the sole, undeniable truth. In a single instant, the edifice of familiar human relationships came crashing down in ruins; for when the mind plunges into the very depths of darkness, one no longer feels any imperative to preserve anything at all. Moti Nandi's short story, **'Shabagar'** is a harrowing narrative of just such a decaying psyche and the terror born of a chilling fear of death. It is a tale set in the cremation ground of the 1970s, where families stood amidst the ashes, engaging in a macabre ritual of living alongside the dead. As people carried the contagion of this terror, and as the primal instincts—hitherto lurking in the shadows of human nature—crawled out into the open, the responsibility to uphold moral values ceased to exist for anyone. A son's overwhelming revulsion toward his father—stripping away the veneer of middle-class morality—drove the father to engage in unbridled, anarchic behavior. Thus, in those turbulent times, the worm-eaten psyche poisoned every established convention. All notions of morality and ethical values were rendered utterly trivial. Consequently, the son's contemptuous attitude toward his father burst forth into the open. And in the wake of this breakdown, the father's own primal instincts—long dormant in the recesses of his mind—surged forth like a river bursting its banks, transgressing every boundary of decency and propriety to find a stage for their unbridled gratification. **'Shabagar'** stands as a faithful chronicle of that turbulent era and the conflicted psychological landscape that defined it.

Keywords: The Turbulent Decade of the Seventies, The Fear of Death, Moral Conventions, Shattered Values, A Psychology of Decay, Latent Primal Instincts, The Chemistry of the Father-Son Relationship.

বাংলার রাজনৈতিক ইতিকথায় সত্তরের দশক মানেই এক উত্তপ্ত আগ্নেয়বলয়। সত্তরের আর্থসামাজিক যাপনচিত্র পরিণত হচ্ছিল এক মৃত্যুশীতল শবাগারে। যে যুগে ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা ও চাপান-উতোরের পারদ। আর তা-ই ত্রস্ত ও ভীত করে তুলছিল সাধারণ জনজীবনকে। এমনই এক বিধ্বস্ত সময়ের পটভূমিকায় চলছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জাতির অতন্দ্র দিনযাপন। নকশালের সেই উত্তাল, অস্থির ও অগ্নিগর্ভ সময়চর্যায় মানবজীবনের স্থিতিসাধনার কোনো উপক্রম ছিল না। সত্তরের বাঙালি সাক্ষ্য থেকেছে সেই রক্তক্ষয়ী আলোড়নের। মানুষকে ক্রমশ পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছিল মৃত্যুভয় ও সংশয়। প্রতিটি চোখেই তখন অবিশ্বাসের দৃষ্টি। পাড়ার গলিতে-গলিতে, মোড়ে-মোড়ে ঘোরে মরণের হাতছানি। বিপর্যস্ত, আলোড়িত সেই সময়ের আবর্তে ধ্বসে পড়ল সমাজের অতীত কাঠামোগুলো। ধাক্কা খেল মধ্যবিত্ত মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ। বিপন্ন সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে অবক্ষয়ী মন নিয়ে মানুষ আত্মযন্ত্রণায় কাতর। মানুষের মনেও সংক্রমিত হয় দুরন্ত ক্যানসার। খসে পড়ে সামাজিক সংস্কার ও মূল্যবোধের আঁটোসাঁটো পলেস্তারা। ভেঙে পড়ে এতদিনের পারিবারিক ও ব্যক্তিসম্পর্কের কাঠামোর ভিতগুলি। তীব্র মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা থেকে মানবমন শামিল হয় অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি। জীবনানন্দও যেমন তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'জীবন' কবিতায় লিখেছিলেন –

> "যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন!-
> জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ !
> মরণ, - সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে !
> বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায় করে প্রাণপণ, - "[১]

সত্তরের সেই ভয়ংকর সময়ও মানুষের মনের অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল। শারীরিক মৃত্যুর চেয়ে যে যন্ত্রণা ছিল আরও ভয়াবহ। নকশালযুগের সেই বিপন্ন সময় ও মানুষের কর্কটাক্রান্ত অবক্ষয়ী মনকেই সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে তুলে এনেছেন সেদিনের বহু কথাসাহিত্যিক। উত্তাল ষাট-সত্তরের বিধ্বস্ত ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকরা যেন ইতিকথার অক্ষর রচনা করেন। আর সময়ের আবর্তে মানুষের ভাঙাচোরা মনের যন্ত্রণা ও অবক্ষয়কেই সামাজিক-পারিবারিক যাপনচিত্রে রূপ দিতে চান সমকালীন সাহিত্যিকরা। রক্তাক্ত ইতিহাস তখন সাহিত্যের ফলকে শৈল্পিক রূপ পায়। ষাট-সত্তরের নকশালপর্বের সেই উত্তাল আগুন এইভাবে রূপ পেয়েছে প্রাবন্ধিক অমলেন্দু সেনগুপ্তের কলমে–

> "কোনো গভীর অসুখের কবলে যেন বর্তমান মানব সমাজ।....সেই উথাল পাতাল সময় ছুঁয়েই.... ষাট সত্তর দশকের ইতিবৃত্ত। নিছক অবিমিশ্র স্বপ্ন ও আশার ঋতু নয় এই দশক দুটি।"[২]

নকশালযুগের উত্তাল গভীর মনোকর্কট মানবমনকে কীভাবে কুরে কুরে খায়; নৈতিক অবক্ষয়, মৃত্যুভয় ও অস্তিত্ব সংকট কীভাবে মানবমনে ঘনীভূত হয়ে ওঠে – তারই স্পষ্ট চিত্রফলক হয়ে উঠেছে মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি। সত্তরের নকশালবাদী রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিপন্ন মন ও ধ্বসে পড়া জীবনকাঠামোর কড়চা হয়ে উঠেছে মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি।

> "যাদের শৈশবে রূপকথার নিশ্চিত আশ্রয় ছিল না, যাদের বাল্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছায়া ফেলল, যাদের কৈশোর গেল দাঙ্গা আর দেশ বিভাগে, সেই আমরা বিশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্দ্ধের যুবকরা কী এক আশ্চর্য সময়কালেই না পৃথিবীকে ভালোবেসেছি। কী এক আশ্চর্য সময়। আশ্চর্য এই ভালোবাসা।"[৩]

এই উক্তি পঞ্চাশের দশকের আর এক মরমী কথাশিল্পী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই কথাটি কেবল দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা নয়; তা তাঁর সমবয়সী সমস্ত সাহিত্যিকেরই সত্য অনুভব। পঞ্চাশের দশকের বৃত্তপটে আবির্ভূত আরেক সমকালীন কথাকার মতি নন্দীর (১৯৩১ – ২০১০) জীবন উপলব্ধিতেও একথা সমানভাবে সত্য। যাঁরা মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী ক্ষয়ীভূত সমাজকাঠামোর মধ্যেই পৃথিবীকে ভালোবেসে শিল্পের রসদ খুঁজেছেন। মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০) মূলত পঞ্চাশের দশকের কথাকার। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি বা শেষদিকে কলম ধরা শুরু করে যাঁরা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সুদৃঢ় স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নিলেন, গল্পকার মতি নন্দী তাঁদেরই একজন। তারপর তাঁকে আর থামতে হয়নি। আপন শৈল্পিক প্রতিভার বলেই সচল থেকেছে তাঁর লেখনী। বিপর্যস্ত, আলোড়িত সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শের ভাঙন, নৈতিক সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণাবোধই তাঁর গল্পে বেশি উপজীব্য হয়ে ওঠে। নাগরিক জীবনচর্যার গলিপথে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে বারবার ধুঁকে মরে তাঁর গল্পের চরিত্ররা। মধ্যবিত্ত মনের সংকট ও মধ্যবিত্ত জীবনসংস্কারকে পর্যুদস্ত করে আত্মপ্রবৃত্তিতে অসংযমী হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টিরা। মধ্যবিত্তের যত্নলালিত আদর্শবোধ ও সংস্কারের স্খলন তাঁর 'শবাগার' গল্পের মুকুন্দ চরিত্রেও প্রকট হয়ে ওঠে। গল্পকার মতি নন্দীর গল্প রচনার সেই মোটিফ(Motif)-টুকু উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক শ্রাবণী পাল তাঁর 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে বলেছেন–

> "বাংলা ছোটগল্পে এই সময়ে একদল শিক্ষিত যুবকের দেখা পাওয়া গেল, যারা দেশপ্রেম বিপ্লব পেশাগত সাফল্য ইত্যাদিতে আস্থা হারিয়ে পরিচয় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ভেসে-চলা জীবনের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল, নিতান্তই ব্যক্তিক খেয়ালে মধ্যবিত্ত যত্নলালিত 'respectability'র জীবনদর্শনকে আঘাত করা'তেই ছিল এদের আগ্রহ।"[৪]

সেইসঙ্গে তাঁর গল্পের পটভূমি হিসেবে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উত্তর কলকাতার গলিপথ ও সেই নাগরিক ভূগোলকেন্দ্রিক জীবন। এখানে আমাদের আলোচ্য 'শবাগার' গল্পের পটভূমিও সেই নকশাল পর্বের কলকাতা ও তৎজনিত অস্থিরতা।

কথাসাহিত্যিক মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ১২ অগ্রহায়ন (১৯৭০), 'দেশ' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে গল্পটি 'কপিল নাচছে' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'শবাগার' গল্পটির পটভূমিতে উঠে এসেছে ষাট-সত্তর দশকের নকশালপর্বের জ্বলন্ত ছবি। যে সময়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। পুলিশী দমননীতির কাছে যেখানে বারবার ঝরে পড়ে অজস্র নিরপরাধ তাজা প্রাণ। এমনই এক উত্তাল ভাঙনপর্বের নাম, ক্রান্তিকালের নাম ষাট-সত্তর দশক। এই সত্তর দশক মুক্তির দশক, আবার সেই সঙ্গে এটি যন্ত্রণা ও সন্ত্রাসেরও দশক বটে। একাধারে অনেকগুলি প্রতিশব্দকে ধারণ করে বয়ে যাচ্ছিল এই সময়টা। সেই বহমান সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে মানবরক্তের তাজা সোঁদাল গন্ধ সেদিনের কোনো শিল্পী-সাহিত্যিককেই স্থির থাকতে দেয়নি। তাই রাজনৈতিক স্পর্শবিচ্যুত হয়েও মতি নন্দীর বিবেক দংশন কলমের খোঁচাতেই শিল্পিত রূপ পেল। এই প্রসঙ্গে 'মতি নন্দীর গল্প-উপন্যাস' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার রবিন পালের উক্তি –

> "মতি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না গেলেও সমকালীনতার দায়কে এড়াতে পারেননি, চানওনি।"[৫]

শিল্পীর সেই দায়বদ্ধতাকে না এড়িয়ে, রক্তনিমজ্জিত সময়ের স্রোত সেঁচে তিনি এই গল্পে রচনা করলেন অবক্ষয়ের কড়চা। সেই অবক্ষয়ের প্রতিনিধি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুকুন্দ। পচনশীল, ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজের গর্ভে মানবমনের অবক্ষয় এখানে চিত্রিত। মুকুন্দ মৃত্যুপথযাত্রী ভাড়াটে গৌরাঙ্গের স্ত্রী শিপ্রার প্রতি নিজের যৌনপিপাসায়, আদিম প্রবৃত্তিতে ধরাশায়ী। মুকুন্দের জৈবতৃষ্ণা সেখানে আবডালের যবনিকা সরিয়ে খুঁজে নিতে চায় শিপ্রার নারীদেহ। সেই প্রাগৈতিহাসিক পিপাসায় মধ্যবিত্ত পিতার সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়ায় বটে। কিন্তু পুত্র মনুর উৎসারিত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশে খসে পড়ল এতদিনের দ্বিধাবোধের আবরণ। সংকটগ্রস্ত সময়ের আবর্তে অবক্ষয়িত মনের একাধিক প্রকোষ্ঠকে লেখক এই গল্পে তুলে ধরলেন মুকুন্দ-মনু-শিপ্রা-গৌরাঙ্গসহ অন্যান্য কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যেখানে মুকুন্দ এই বিপন্ন সময়ের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, নিজের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করতে করতে নিজেই নিজের শবাগার রচনা করে। এবার আমরা মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে নেব।

'শবাগার' গল্পের সূত্রপাতই ঘটেছে মৃত্যুসংবাদ দিয়ে। এক মধ্যবিত্ত শহুরে কর্মচারী এ গল্পের মুখ্য চরিত্র। সমকালে অজস্র ঘটে চলা করোনারি থ্রমবোসিসের মৃত্যু-প্রহেলিকা তাকে আতঙ্কিত করে। যেন পিছু ধাওয়া করে বেড়ায় তার সজীব চৈতন্যের ক্ষেত্রটিকে। তবু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারী গৃহবধূ লীলাবতীকে অতিক্রম করে মুকুন্দর জৈবপ্রবৃত্তি শিপ্রার শরীরে চরিতার্থতা খুঁজতে চায়। মৃত্যুভীতির চোখরাঙানি উপেক্ষা করেও শিপ্রার সদ্যস্নাত শরীর মুকুন্দর যৌনপিপাসার রসদ জোগায় –

> "চিবুক এবং বগলের কেশ থেকে জল গড়াচ্ছে। হাসতে গিয়েই ভারসাম্যটা টলে গেল সামান্য। তাইতে ওর বুক ও পাছার যৎসামান্য কম্পনটুকু উপভোগ করতে করতে মুকুন্দ মাজনের ফেনা গিলে, চেটো দিয়ে কষ মুছে নিয়ে হেসে লীলাবতীকে বলল – 'এর থেকেও পাজি রোগ ক্যানসার'।"[৬]

এই শিপ্রা হল মুকুন্দের নীচের তলার ভাড়াটে গৌরাঙ্গের স্ত্রী। ক্যানসার রোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী গৌরাঙ্গের মৃত্যুর প্রহর গুনছে স্ত্রী শিপ্রাও। তাই একটা অসহায় নারী হিসেবে নিজের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাটুকু এখন থেকেই ঠিক করে নিতে চাইছে সে। তার বিনিময়ে সে বাড়ির মালিক মুকুন্দকে বন্ধক দিয়েছে নিজের নধর নারীশরীরটা। শিপ্রার সেই যৌন প্রশ্রয়ই মুকুন্দের হাতকে শিপ্রার পাছা অবধি পৌঁছে দিয়েছে। এভাবেই সত্তরের উত্তর কলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নীচুতলায় বয়ে যাচ্ছিল অবৈধ যৌনসম্পর্কের চোরাস্রোত। সেই স্রোতে গা ভাসিয়েই তাদের যৌনচুম্বনে ঠোঁট ডোবাতে চাওয়া। গুপ্ত যৌন আবেশের সেই চোরা মুহূর্ত অতৃপ্ত হয়ে রইল মুকুন্দর বাইশ বছরের পুত্র মনুর উপস্থিতিতে। একান্ন বছর বয়সী এক মধ্যবয়স্ক, প্রৌঢ়পিতার যুবকপুত্রের সামনে এমন নিরাবরণ; তার পিতৃত্বের মাংস খুবলে খায় বৈকি–

> "মনু সদর দরজার কাছে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দর শরীরের মধ্যে তখন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথায় উঠছে, হাড় থেকে মাংস খুলে খুলে পড়ছে।"[৭]

এরপর থেকেই একমাত্র পুত্রের সামনে মুকুন্দর নৈতিক অবক্ষয়ের প্রকাশ্যতায় শুরু হল তার মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তৈরি হল আহত পিতৃত্বের নিরাপত্তার সংশয়। তার প্রতি মনুর ঘৃণার আশঙ্কায় তার যৌনতাতাড়িত

মনটাও যেন এবার থেকে হুমড়ি খেতে থাকল পিতৃত্বের দিকে। এক পঞ্চাশোর্ধ্ব পিতার মানসিক দ্বন্দ্ব গল্পকারের কলমে রূপ পেল এভাবে –

> "মুকুন্দ তখন ভাবতে লাগল, আরো পনেরো কুড়ি বছর যদি বাঁচি তাহলে মনুকে নিয়েই তো বাঁচতে হবে! কিন্তু কি করে বাঁচব যদি ও ঘেন্না করে?"[৮]

গল্পে এরপর থেকেই দেখি থ্রমবোসিসের মতো মৃত্যুভয় মুকুন্দকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। সেইজন্য বুকপকেটে তার শব শনাক্তকরণের উপায়স্বরূপ স্বপরিচয়জ্ঞাপক চিরকূট রেখে সে আত্মসান্ত্বনার অবকাশ খোঁজে। এ তো মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখা! এই মৃত্যুবিভীষিকাই মুকুন্দকে তাড়িত করেছে চৈতন্যের এক প্রকোষ্ঠ থেকে অন্য প্রকোষ্ঠে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পের মতো তাঁর 'পর্দার নীচে এক জোড়া পা', 'বাওয়াব', 'একটি মহাদেশের জন্য', 'পিকনিকের অপমৃত্যু' ইত্যাদি গল্পেও বারবারই মৃত্যুভীতি, ভয়ংকর সময়ের আলোড়ন ও তা থেকে ঘটে চলা অস্তিত্বের অবক্ষয়, নৈতিক সংকট ইত্যাদি বড় হয়ে ওঠে। আসলে পুত্রের ঘৃণা তার শবদেহেও ঝরে পড়বে কিনা সেই আশঙ্কায় দ্বিধান্বিত তার পিতৃমন। প্রকৃত অর্থে সত্তরের বিপর্যস্ত দিনগুলিতে আর্থসামাজিক ভাঙনপর্বেই তো মুকুন্দ শিপ্রার শরীরে নিজের যৌনপিপাসা চরিতার্থ করার অবসর পেয়েছে। সেই সত্তর এইভাবেই নৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্গে পিতৃমনে তৈরি করে দিল এক অস্তিত্ব-সংকট।

সত্তর দশকের রক্তাক্ত দিনগুলিতে ঘরে বসেও মানুষের নিরাপত্তা ছিল না। আর পথেঘাটে তো ছিলই না। সর্বদা মানুষের প্রতি মানুষের এক আড়চোখে তাকানো বাঁকা সংশয়, অবিশ্বাস। সত্তরের সেই অগ্নিগর্ভ প্রহরে, রাজনৈতিক অস্থিরতায় গোলা-বারুদ-বন্দুকের স্তূপ সরিয়ে মুকুন্দকে অফিস থেকে ঘরে ফেরার পথ করে নিতে হয়। জীবন সেখানে কঠিন। গলিতে-গলিতে, জমাট অন্ধকারে সর্বত্রই যেন মৃত্যুর ঈশারা। রাস্তায় পুলিশী পর্যবেক্ষণের মুখে পড়ে এক মৃত যুবকের মৃতদেহ শনাক্ত করতে গিয়ে মনু ভেবে শঙ্কিত হয় মুকুন্দর পিতৃত্ব। আসলে মৃত্যুভয়তাড়িত সময়ের আবর্তে মানুষ সর্বদা নিজের ও আপনজনের মৃত্যুই দেখে। মুকুন্দও তা-ই দেখেছিল। নকশালপর্বে একঝাঁক তরুণ ও যুবকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই লড়াইয়ে। আর তার থেকেও কঠিন হয়ে উঠেছিল পুলিশী দমননীতি। নকশাল আন্দোলনের এই প্রকৃতিটুকু প্রাবন্ধিক বিজিত ঘোষের 'নকশাল আন্দোলনের গল্প' গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় ('সম্পাদকের কৈফিয়ৎ') উঠে এসেছে এভাবে–

> "নকশালবাদীদের ডাকে বিপ্লবের নামে হাজার হাজার তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মদানে। অগণিত যুবক, কিশোর প্রাণ হারায়।"[৯]

এই গল্পে মনুর সমবয়সী যুবক তাজুর মৃত্যুও তারই প্রতীক। সে যুগে বিনা পরোয়ানায় স্রেফ সন্দেহের বশেই পুলিশ অসংখ্য যুবককে হত্যা করে। প্রতিটি যুবকই তখন প্রশাসনিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার। প্রশাসনই তখন অজস্র তাজা প্রাণের নির্বিচার ঘাতক। সেই সন্দেহের বশেই এই গল্পেও উঠে এল অজস্র তরুণের প্রাণ ঝরে যাওয়ার কথা। মুকুন্দের অফিস-সতীর্থ শিশিরের বয়ানে উঠে এসেছে সেই অনিরাপত্তার প্রসঙ্গ –

> "এখন সব থেকে সেফ বুড়ো হয়ে যাওয়া। আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিশ রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটুদুটো এখনও ভালো করে মুড়তে পারে না। আমি জানি ছেলেটা কোনো গোলমালে নেই। শুধু ডাঁটো বয়সের জন্যই ওর সর্বনাশ হল।"[১০]

এমন আশঙ্কায়, দ্বন্দ্বে বারবার অনিরাপত্তাবোধের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছে মধ্যবয়সী মুকুন্দের পিতৃত্ব। যুবশক্তির ওপর সেই পুলিশী নির্যাতন এ গল্পে জীবন্ত দলিলের রূপ নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, মতি নন্দীর এই 'শবাগার' গল্পের মতো ষাট-সত্তরের দশকের সেই রক্তক্ষয়ী আলোড়ন, উত্তাল পরিস্থিতি, বীভৎস মৃত্যু, সন্দেহ, অবিশ্বাসের ছবি উঠে এসেছে তপোবিজয় ঘোষের 'এখন প্রেম', অসীম রায়ের 'অনি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পলাতক ও অনুসরণকারী', মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' ইত্যাদি গল্প ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কেন এল না' ইত্যাদি কবিতায়। সত্তরের সেই উত্তাল আবর্তই নির্মাণ করে দিল এই গল্পের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি।

সেদিন অপার মৃত্যুর স্তূপ ঠেলে বাড়ি ফিরে মুকুন্দ তার নৈতিক কর্তব্যে ফেরার কৃত্রিম মূল্যবোধ জাগাতে চাইল। তাই সে শিপ্রার কাছে গৌরাঙ্গের অবস্থার খোঁজ নিল। শিপ্রা নিজের যৌনাচারে শঙ্কিতও বটে। তবে আর্থসামাজিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে মুকুন্দের প্রতি দায়বদ্ধ দরদকে মুছে ফেলতে পারবে না। সেইজন্যই তো মুকুন্দর বাড়ি না-ফেরা; অনাত্মীয় শিপ্রাকেও আতঙ্কিত করে। গোলা-বারুদের পাহাড় ভেঙে মুকুন্দ বাড়ি ফেরার পর, পিতার প্রতি পুত্রের রাস্তাঘাটের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তা ও উদ্বিগ্নতা তার পিতৃহৃদয়কে সম্পৃক্ত করে। মুকুন্দর তখন মনে হয় –

"ছেলেটা আমার জন্য ভাবে, হয়তো বমি করবে না।"[১১]

এই আত্মস্বস্তি মুকুন্দকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। কিন্তু তারপরেই ঘটে সেই দারুণ বিপর্যয়। পুলিশী হেফাজতে থানাবন্দী হল মুকুন্দর যুবপুত্র মনু ওরফে মানবেন্দ্র সেন। এই খবর মুকুন্দর পিতৃত্বকে আসন্ন বিপদ সম্ভাবনায় কম্পিত করে। মৃত্যুভয়তাড়িত একটি মানুষের আত্ম-অস্তিত্ব ক্ষরিত আত্মজকে, নিজের উত্তরাধিকারকে বাঁচাতে থানায় গিয়ে সে কি গভীর আকুতি! তখন ছটফট করা যন্ত্রণায় নিজের অস্তিত্ব সংকটে কাতর হয়েছে মুকুন্দ। ছেলের মুক্তি তার মনকে তৃপ্তির রসদ জোগালেও; মনুর চোখে মুকুন্দ খুঁজে পেয়েছে শিপ্রার মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী গৌরাঙ্গের জমাটবাঁধা ক্রোধ, ঘৃণা ও বিবমিষা –

> "ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে সে গৌরাঙ্গের চোখদুটি দেখতে পেল। ঠিক এই চাহনিতেই সে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। মুকুন্দর আবার মনে হল, মনুর যেন ক্যানসার হবে।"[১২]

পরিস্থিতির অসহায়তা যেমন গৌরাঙ্গের সমস্ত চেতনা ও প্রতিবাদকে গৌরাঙ্গের দৃষ্টিতে সন্নিবেশিত করেছিল; ঠিক তেমনই মনুরও পিতার প্রতি সমস্ত অব্যক্ত বিবমিষা গিয়ে সঞ্চিত হয়েছিল মনুর চোখে। তখন থেকেই খসে পড়তে লাগল মুকুন্দের এযাবৎ লালিত সংস্কারের পলেস্তারা। তীব্র মানসিক আঘাতে মুকুন্দ সেদিন বাড়ি এল মাতাল হয়ে। এক বিপন্ন সময়ের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাড়তে থাকল পিতাপুত্রের সম্পর্কের ফাটল। আসলে সেই রক্তক্ষয়ী সময়ের বাতাবরণই এই পটভূমি তৈরি করে দিল। তবুও মুকুন্দ এই ফাটল জোড়া লাগাতে চেয়েছে তার পিতৃত্বের সুতোয়। ছেলের প্রতি উদ্বেগের কারণ জানিয়ে মুকুন্দর ঘুণধরা, আহত পিতৃত্বের আকুতি –

"আমাকে ঘেন্না করার নিশ্চয় অন্য কারন আছে কিন্তু এজন্য করিসনি।"[১৩]

সেই সংঘাতপূর্ণ, বিধ্বস্ত সময়ের স্রোত এভাবে বহু সম্পর্কে বিভেদরেখা বইয়ে দেয়। এমনকি বহু পিতাপুত্রের সম্পর্কেও। সময়ের উত্তাল অস্থিরতায় পিতাপুত্রের সম্পর্কের নির্মম ফাটলদৃশ্য এই গল্পের মতো প্রকট হয়ে উঠেছে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু', মতি নন্দীর 'চোরাঢেউ', 'কপিল নাচছে', 'ব্লেজার',

'ছটা পয়তাল্লিশের ট্রেন', 'রাস্তা', 'দুভাগে' ইত্যাদি গল্পে এবং মতি নন্দীর 'দ্বাদশ ব্যক্তি', 'সাদা খাম', 'বারান্দা', 'পুবের জানালা' প্রভৃতি উপন্যাসেও। 'শবাগার' গল্পেও মৃত্যুতাড়িত সত্তর দশকের অস্থির আবর্তই এই কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টির কারণ।

'শবাগার' গল্পে পিতাপুত্রের এই সংঘাত চরমতা লাভ করে মনুর এই উক্তিতে –

> "তোমার জন্য; শুধু তোমার জন্য। তুমি আমায় করাপ্ট করেছ।"[১৪]

মনু তার নীতিভ্রষ্টতার দায় প্রকাশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে বাবার দিকে। বাবার নৈতিক অবক্ষয়, চারিত্রিক ভ্রষ্টতা মনুকে অসংযমী করেছে তাদের পিতাপুত্রের সম্পর্কে। পিতার সঙ্গে বাকযুদ্ধের এই নিয়ন্ত্রণহারা মূল্যবোধের জন্যও সে কাঠগড়ায় তুলেছে পিতাকেই। আসলে শিপ্রার সঙ্গে বাবার সেই অসামাজিক যৌন কদাচারের ছবি মনুর চেতন-অবচেতনে তার মর্মবোধকে আহত করে। বারবার দংশন ঘটায় তার প্রথাগত মূল্যবোধ ও সংস্কারের চামড়ায়। মনুর অন্তর্চেতনায় মিশে থাকা পিতার প্রতি সেই ঘৃণা, বিবমিষাই বমিরূপে বেরিয়ে আসে মুকুন্দের গায়ে –

> "'কি হল'! বলে মুকুন্দ দ্রুত গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। মনু তখন হড়হড় করে মুকুন্দর গায়ে বমি করল।"[১৫]

মনুর এই বমন কেবল শারীরিক থুৎকার নয়। এ তার চেতনায়, অস্তিত্বে মিশে থাকা মুকুন্দের প্রতি তীব্র ঘৃণা। যে ঘৃণা সে বহন করছিল শিপ্রার দরজার সামনের সেই চোরাদৃশ্য দেখা থেকেই। বাবার প্রতি লালিত সেই ঘনীভূত ঘৃণাই সে তার গায়ে উগরে দিয়েছে বমিরূপে। তাহলে এখন আর থাকল না কোনো প্রচলিত সংস্কারের আবডাল। এতদিন পর্যন্ত শিপ্রার প্রতি মুকুন্দর যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থতা পাচ্ছিল আড়ালে-আবডালে, সামাজিক সচেতনতায়। কিন্তু যখনই ছেলের মনে জমে ওঠা ঘৃণা বমিরূপে বেরিয়ে এল, তখনই খসে পড়ল মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের পলেস্তারা। সত্তরের উত্তপ্ত আবর্ত, মনুর সপ্রকাশ্য ঘৃণা ও বমনই মুকুন্দর নৈতিক অবক্ষয়ের মাত্রাকে সম্পূর্ণ করল। এবার সে লিপ্ত হবে যৌন-স্বেচ্ছাচারে। সর্বোপরি মুকুন্দর দিক থেকে আর কোনো সামাজিক সংস্কারের গোপনীয়তা বা আবডাল রইল না। বাবার যে অবৈধ প্রবৃত্তির জন্য মনুর আজ প্রকাশ্য ঘৃণা; সেই প্রবৃত্তির গোপনীয়তা রক্ষার দায় আর তাই মুকুন্দর রইল না। সে তখন মাঝরাতে শিপ্রার ঘরে নেমে এসে মৃত্যুপথযাত্রী গৌরাঙ্গের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে তার যৌনক্ষুৎপিপাসাকে চরিতার্থতা দিয়েছে। তার এই সপ্রকাশ্য নিরাবরণে আর কোনো লজ্জা নেই –

> "শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুন্দ বলল, 'ও তো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের'।"[১৬]

এভাবে লেখক মতি নন্দী অবক্ষয়িত সময় ও সমাজের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তী কথাশিল্পী জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো মানুষের আত্মপ্রতারণা, মুখ-মুখোশের দ্বন্দ্ব ও জৈবপ্রবৃত্তিতাড়িত চেতনাকে সার্থক রূপ দিলেন এই গল্পে। মধ্যবিত্ত মুকুন্দ আত্মপিপাসার রাজত্বে যৌনতৃষ্ণার পাহাড় নিয়েও নিজের প্রবৃত্তিকে চাপা রাখার অগাধ প্রয়াস চালিয়েছে। রক্ষা করতে চেয়েছে নিজের পিতৃত্বের 'ইমেজ'(Image)টুকু। কিন্তু পিতাপুত্র সম্পর্কের চওড়া ফাটল ও সপ্রকাশ্য ঘৃণা সেই মেকি নিয়ন্ত্রণকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। বরং তা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে নীচের তলায় শিপ্রার ঘরে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে বলেছেন –

> "এইসব গল্পে মতি নন্দীর রঞ্জন-রশ্মি-দৃষ্টিতে আমাদের সমস্ত দুর্বলতা আত্মপ্রতারণা উদঘাটিত হয়েছে।"[১৭]

মুকুন্দদের সেই আত্মপ্রতারণাকে এ গল্পে চিনিয়ে দিলেন গল্পকার। যে আত্মপ্রতারণা সত্তরের বিক্ষুব্ধ সময়সঞ্জাত। যে মেকি ছলনা, নৈতিক অবক্ষয় ও মধ্যবিত্ত জীবনসংকটের ফাঁদ তৈরি করে দিয়েছিল সময়। যে সময়টার নাম ষাট-সত্তর দশক, যার নাম উত্তাল আবহ।

'শবাগার' শব্দের অর্থ হল মৃতদেহ রাখার স্থান অর্থাৎ মর্গ বা লাশকাটা ঘর। যে শব্দটি এক ভয়ংকর শীতল মৃত্যুবিভীষিকার ছবি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে। এই গল্পজুড়ে বহাল থেকেছে মানুষের সেই মৃত্যুভয়ই। প্রতিটি মানুষকেই সেই মৃত্যুভয় তাড়া করে বেড়িয়েছে। আর তার সর্বোচ্চ যন্ত্রণাদীর্ণ শরিক হয়েছে মুকুন্দ। সে নিজেরসহ ছেলের মৃত্যুভয়েও পীড়িত। তার যন্ত্রণা তাই দ্বিগুণ। সত্তরের দশকের বিপন্ন সময়ের দায় আপন রক্তে মিশিয়ে নিয়ে এ গল্পে মুকুন্দ 'করাপ্টেড' হয়েছে তার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে। এভাবে সমাজের বুকে তার নৈতিক মনের অপমৃত্যু ঘটিয়ে মুকুন্দ নিজের হাতেই নিজের শবাগার সুসজ্জিত করে তুলেছে। তাই সামগ্রিক বিশ্লেষণে বলা যায়, ষাট-সত্তর দশকের সেই উত্তাল রাজনৈতিক আবর্তই সৃষ্টি করেছিল ভগ্নপ্রায় আর্থসামাজিক কাঠামোর। বলা ভালো সেই ভগ্নতার শিকার হয়েই শিপ্রা-গৌরাঙ্গরা মুকুন্দদের বাড়ির ভাড়াটে। সেই সুযোগেই মুকুন্দের জৈবক্ষুৎপিপাসা উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে নিতে চায় শিপ্রাদের নারীমাংসে। তা থেকেই মুকুন্দদের অপরাধবোধের গ্লানি, আহত পিতৃত্ব রক্ষার দায়। আর সর্বোপরি পচনশীল সময়ের ঘূর্ণাবর্তে চৈতন্যতাড়িত মৃত্যুভয়। উত্তপ্ত সময়ের আবর্তে মুকুন্দের মনেও তৈরি হয়ে ওঠে একটা আস্ত শবাগার। যেখানে মুকুন্দ দেখতে পায় আত্মশব। যে মগ্নচৈতন্যে সে নিজের মৃতদেহের ঘ্রাণ পায়। আর মুকুন্দর মনের বাইরেও বিপন্ন সময়, ভেঙে পড়া আর্থসামাজিক কাঠামোর আলোড়নে গোটা গল্পটাই যেন হয়ে উঠেছে এক মস্ত শবাগার। এই ব্যঞ্জনায় গল্পের নামকরণও তার শৈল্পিক সার্থকতা খুঁজে পায়। সবশেষে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তি দিয়েই 'শবাগার' গল্পটির মূল্যায়ন করা চলে –

> "মতি নন্দীর বড় কৃতিত্ব, অনায়াস ভঙ্গিতে মানুষের ভেতরের চেহারাটা দেখানো। অপরাধবোধ কীভাবে আমাদের অতি-পরিচিত সাধারণ মানুষকে কুরে কুরে খায় তা নিপুণভাবে দেখিয়েছেন মতি নন্দী। তাঁর গল্পের ভিত্তি বাস্তব-অভিজ্ঞতা, কিন্তু তার শিল্প-রূপায়ণে মতি নন্দীর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। .....মতি ছুঁয়ে আছেন অবিশ্বাসকে, সংশয়কে।"[১৮]

এভাবে আলোড়িত সত্তরের পারদ ছুঁয়ে, সমাজের প্রত্যক্ষ শবাগারে দাঁড়িয়ে গল্পকার মতি নন্দী মুকুন্দের মনের ব্যবচ্ছেদ ঘটালেন। অস্তিত্ব সংকটে অপমৃত্যু ঘটে যাওয়া মুকুন্দের মনের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে তিনিও রচনা করলেন এক হিমশীতল শবাগার। যে শবাগারের বাসিন্দা মুকুন্দ। যে শবাগারে আপন শবদেহের পচনশীল দুর্গন্ধ মুকুন্দকে অতিষ্ঠ করে তোলে। সেই স্বরচিত শবাগারের যন্ত্রণাদগ্ধ দহন মুকুন্দকে বাস্তবিক শবাগারের অভিযাত্রী করে তোলে। তাকে উৎকণ্ঠা, সংশয়ে মুখোমুখি করে তোলে এক অচেনা মৃত্যুচেতনার। তাই সবশেষে প্রবৃত্তিতাড়িত পচনশীল মনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে মুকুন্দ তার মানসিক অপমৃত্যুটুকু রোধ করতে চাইল চিরতরে। তবুও এই উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি নেই। কারণ সময়টা সত্তর। তখন শিয়রে শমন, আর ঘরে-ঘরে শবাগার। কলকাতার মহানাগরিক জীবনের অন্ধস্রোত গিয়ে মিশল মহাকালের রাজপথে। সাহিত্যের ফলকে মতি নন্দীর 'শবাগার' হয়ে থাকল প্রত্যয়ী ইতিকথার বিশ্বস্ত বর্ণমালা। সত্তরের উত্তাপদগ্ধ আবর্ত এভাবে

রচনা করে দিল অবক্ষয়ী মন ও বিপন্ন সমাজের আনকোরা অগ্নিকুণ্ড। যেখানে থাকে শুধু অন্ধকার, থাকে শুধু হিমশীতল মৃত্যুভয়! সময়ের এমন উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে এত হিমশীতল স্নায়ু-মৃত্যুর কথা কে-ই বা জানত!

তথ্যসূত্র:

১। দাশ, জীবনানন্দ। 'জীবন' কবিতা। ইসলাম, রেজওয়ানুল, সম্পাদনা, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, মাইতি বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ-১০৭।

২। সেনগুপ্ত অমলেন্দু। 'মুখবন্ধ' অংশ। জোয়ার ভাটায় ষাট সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, কলকাতা।

৩। বন্দোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ। 'আমাদের যৌবন ও স্বাধীনতা', দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬০, কলকাতা।

৪। পাল, শ্রাবণী। 'বাংলা ছোটগল্পের ধারা : বিশ শতক' (ভূমিকা)। পাল, শ্রাবণী, সম্পাদনা, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক, অক্ষর প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, কলকাতা, পৃ-২৭।

৫। পাল, রবিন। 'মতি নন্দীর গল্প-উপন্যাস'। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, সম্পাদনা, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, প্রজ্ঞাবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ-৫৮।

৬। নন্দী, মতি। 'শবাগার'। নন্দী, মতি, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১৬২।

৭। তদেব, পৃ-১৬৩।

৮। তদেব, পৃ-১৬৩।

৯। ঘোষ, বিজিত। 'সম্পাদকের কৈফিয়ৎ' (ভূমিকা)। ঘোষ, বিজিত, সম্পাদনা, নকশাল আন্দোলনের গল্প, পুনশ্চ, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা, পৃ-৭।

১০। নন্দী, মতি। 'শবাগার'। নন্দী, মতি, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১৬৫।

১১। তদেব, পৃ-১৬৭।

১২। তদেব, পৃ-১৬৯।

১৩। তদেব, পৃ-১৭১।

১৪। তদেব, পৃ-১৭১।

১৫। তদেব, পৃ-১৭১।

১৬। তদেব, পৃ-১৭১।

১৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, কলকাতা, পৃ- ৪৪৬।

১৮। তদেব, পৃ- ৪৪৫।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ:

১। আচার্য, অনিল। সম্পাদনা। সত্তর দশক, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪, কলকাতা।

২। ঘোষ, নির্মল। নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৩। ঘোষ, ফটিকচাঁদ। নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৪। দাস, অরূপকুমার। ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১২, কলকাতা।

৫। বন্দোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ও চট্টোপাধ্যায়, সাধন। সম্পাদনা। প্রতিবাদের গল্প : নকশালবাড়ি। রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, কলকাতা।

৬। ভট্টাচার্য, দেবাশিস। সত্তরের দিনগুলি। এখন বি-সংবাদ, ২৫তম বইমেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা।

৭। দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা কথাসাহিত্যের একাল। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, কলকাতা।

৮। চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য। নবম প্রকাশন, ১৯৮৯, কলকাতা।

৯। মুখোপাধ্যায়, সত্য। সম্পাদনা। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্কট, রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৮৬, কলকাতা।

১০। মুখোপাধ্যায়, তরুণ। সম্পাদনা। বাংলা ছোটগল্প : পর্ব-পর্বান্তর, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা।

১১। চক্রবর্তী, সুমিতা। ছোটগল্পের বিষয় আশয়। পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০২১, কলকাতা।

১২। ঘোষ, প্রসূন। বাংলা ছোটোগল্প : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। আশাদীপ, প্রথম প্রকাশ, মে ২০২৩, কলকাতা।

১৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটোগল্প : সময়ের শিল্প। এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৬, কলকাতা।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। 'সময়ের দাগ ও বিদীর্ণ দর্পণ'। 'দেশ' পত্রিকা, ৪ এপ্রিল ১৯৮৭, কলকাতা।